ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৪২৬

শওকত আলীর *পিঙ্গল আকাশ* উপন্যাসে নারীর মনঃসমীক্ষণ

*জাকিয়া রহমান

সারসংক্ষেপ: বাংলা কথা সাহিত্যে এক অনন্য শক্তিমান লেখক শওকত আলী। বহুমাত্রিক বিষয় নিয়ে তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন। *পিঙ্গল আকাশ* (১৯৬৩) উপন্যাসটি শওকত আলীর (১৯৩৬-২০১৮) প্রথম উপন্যাস। এ উপন্যাসে স্থান পেয়েছে ষাটের দশকের মধ্যবিত্ত জীবন যন্ত্রণার চিত্র। বিবাহবহির্ভূত ক্লেদাক্ত প্রেম ও কামের এক বীভৎস আদিমতম রূপ ফুটে উঠেছে এ উপন্যাসে। নারীর মনের সীমাহীন চাওয়া, কামনা, বাসনা ও তা লাভ করার প্রয়াসে নোংরা নিষিদ্ধ প্রেম কীভাবে নিজেকে নিঃশেষ করেছে সে চিত্র এবং নগরায়ণের স্রোতে গা ভাসানো মধ্যবিত্ত শ্রেণির পুরুষের উচ্ছৃঙ্খল জীবন ও চক্রান্তে শুদ্ধ শুভ্র সুন্দরের প্রতীক মঞ্জুর শুদ্ধতার নির্মল আকাশকে কীভাবে পঙ্কিলতায় ভরিয়ে দিয়েছে, সে আত্মকথন ও মর্মবেদনা ধ্বনিত হয়েছে *পিঙ্গল আকাশ* উপন্যাসে। নারী পুরুষের আদিমতম প্রবৃত্তি বিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড যার নাম দিয়েছিলেন লিবিডোতত্ত্ব। সেই লিবিডোতত্ত্বের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে *পিঙ্গল আকাশ* উপন্যাসে। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনে মানুষের উচ্ছৃঙ্খলতা, নারীর মনোবিকৃতি, অসভ্য আদিমতম তাড়না আর জীবনের রুচিহীনতা, এরই মাঝে মঞ্জুর শুভ্র সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার আকুলতা এবং সবশেষে পুরুষের লালসার শিকারে মঞ্জু কীভাবে পরাজিত হয়ে আত্মহত্যার জন্য অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায় তার স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

ভূমিকা

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক শওকত আলীর জন্ম ১৯৩৬ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ ভারতের বাংলা প্রদেশের দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত রায়গঞ্জ থানায়। বিরলপ্রজ এই আধুনিক মনস্ক কথাসাহিত্যিকের চিন্তাধারায় যে বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায় তা মূলত দাদা গওহর আলী ও পিতা খোরশেদ আলী সরকারের মতো আধুনিক মনস্ক অভিভাবকের ছায়াতলে বড়ো হয়ে উঠার ফলাফল মাত্র। পারিবারিকভাবে শওকত আলী আধুনিক চিন্তাধারার শিক্ষা সংস্কৃতির চর্চা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। বিভাগোত্তরকালে শওকত আলীর পরিবার সাম্প্রদায়িক রোষানলের শিকার হলে, এক সময় রায়গঞ্জে থাকা তার জন্য নিরাপদ রইল না। সে কারণেই ১৯৫১ সালের শেষের দিকে শওকত আলী ও তাঁর পরিবারের সকলে রাতের অন্ধকারে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের দিনাজপুর শহরে চলে আসেন। তিনি দেশভাগের পূর্বে ওপার বাংলা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে ছিলেন আর দেশভাগের পরবর্তীতে এপার বাংলা তথা পূর্ববঙ্গে চলে আসেন। তাই একথা স্পষ্ট যে তিনি দুই কালের দুই বাংলার সুখ-দুঃখের প্রত্যক্ষদর্শী। অর্থাৎ বিভাগ পূর্ব পশ্চিমবঙ্গের সমাজ সংস্কৃতি পরিবেশ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মীয় কোন্দল এবং ১৯৪৭ এ ধর্মভিত্তিক দেশভাগ ও তৎপরবর্তী সমাজিক পরিবেশ, জীবন-যাপন ও রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রত্যক্ষদর্শী। যা লেখকের চেতনায় স্থান লাভ করেছে এবং স্বাভাবিকভাবেই সমসাময়িককালের সমাজ ও জীবন তাঁকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। মানুষের জীবনের জটিলতা, কুটিলতা, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, বিদ্রোহ, নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনপ্রবাহ রাজনৈতিক চেতনার আবহ, বাঙালি ঐতিহ্য, গ্রামীণ সমাজ এবং

* প্রভাষক, বাংলা, রাজশাহী কোর্ট কলেজ, রাজশাহী

মুক্তিযুদ্ধ স্থান পেয়েছে তাঁর উপন্যাসে। "নাগরিক জীবনের যান্ত্রিকতা ভোগলিপ্সা, সুবিধাভোগী, তোষামোদী শ্রেণির রিরংসা, বিকৃত মানসিকতা, প্রতারক টাউট-বাটপার ও দালালদের বিকলাঙ্গরূপ এবং গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষের টিকে থাকার লড়াইসহ জীবন ও জগতের সামগ্রিক রূপ রূপায়িত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে।"[১] সব্যসাচী এই লেখক একাধারে রচনা করেছেন গল্প, প্রবন্ধ ও উপন্যাস। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় বত্রিশটি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস- *পিঙ্গল আকাশ* (১৯৬৩), *অপেক্ষা* (১৯৮৫), *ভালোবাসা কারে কয়* (১৯৮৮) *পতন* (১৯৯২), *প্রদোষে প্রাকৃত জন* (১৯৮৪), *দক্ষিণায়নের দিন* (১৯৮৫), *কুলায় কাল স্রোত* (১৯৮৬), *উত্তরের ক্ষেপ* (১৯৯১) ইত্যাদি।

নারীর মনঃসমীক্ষণ পর্যালোচনাঃ

পিঙ্গল আকাশ উপন্যাসটি ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত। প্রথম উপন্যাস হলেও এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও ভাষা অত্যন্ত সুগঠিত। মনস্তাত্ত্বিক সমীক্ষণ ও জটিল কঠিন আদিমতম প্রবৃত্তির নেশাজালে আবিষ্ট মানুষের যাপিত জীবন, লঘু আনন্দ লাভ, সংশয়, দ্বিধা, ভয়, লোভ, হিংসা ও এর মর্মান্তিক পরিণতির সুন্দর মানচিত্র লেখক সচেতন প্রয়াসে এঁকেছেন *পিঙ্গল আকাশ* উপন্যাসে। "মধ্যবিত্তের বিকৃতি ও ব্যক্তির বিনষ্টিই চিত্রিত হয়েছে এ উপন্যাসে। সুস্থ জীবনের স্বপন ও আকাঙ্ক্ষা এখানে অবরুদ্ধ। নাগরিক মধ্যবিত্তের বিত্তসর্বস্বতা, ক্রমবর্ধমান পুঁজির প্রভাবে মূল্যবোধের অবক্ষয়, রুচি-বিকার, যৌন-বিকৃতি, ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা, হাহাকার, বেদনা ও রক্তক্ষরণের রূপকল্প *পিঙ্গল আকাশ*"[২] *পিঙ্গল আকাশ* উপন্যাসটির উপস্থাপনার ভঙ্গিতে মনোগ্রাহী ও পাঠকের চিত্ত আকর্ষক। বর্ণনায় ঝড় ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ প্রবল শিলাবৃষ্টির তীব্র তাণ্ডবের মাঝ রাতে লেখক চন্দন শূন্য ঘরে আলো-আঁধারিতে মানবিক স্বভাবসুলভ আত্মচিন্তায় কল্পনার জাল বুনছে। এমনই এক রাতে আকস্মিকভাবে লেখক চন্দনের ঘরে মঞ্জুর আগমন। কাহিনি পাঠে পরিষ্কার হলো উপন্যাসের শেষ দৃশ্য। লেখক শেষের মাঝেই সূচনার বীজ রোপণ করে বিকশিত করেছেন কাহিনি ও চরিত্রকে। চরিত্রের অবস্থান ক্রিয়াকলাপ ও তাদের সক্রিয়তায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে মনঃসমীক্ষণের বিষয়টি। নারী চরিত্রের বিচিত্র স্থূলবুদ্ধি, বৈষয়িক ভাবনা এবং পুরুষের লালসার লেলিহান শিখায় শুভ্রতার অগ্নিদহন আস্তে আস্তে প্রস্ফুটিত হয়েছে এ উপন্যাসে।

উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র মঞ্জু। ১৬/১৭ বছর বয়সি মঞ্জুর শরীর বিকশিত। তার সৌন্দর্য নজর কাড়ে যে কোনো পুরুষের। তাইতো মঞ্জুর খালাতো ভাই বেনুর নজর পড়েছে মঞ্জুর শরীরের দিকে। এ উপন্যাসে নারী চরিত্রের সংখ্যা বেশি। মঞ্জু, মঞ্জুর মা সালেহা, ছোটো আপা ফরিদা, খালার ভাসুরের মেয়ে তাজিনা, বান্ধবী রঞ্জু, নাসিমা ও সকিনা খালা প্রমূখ নারী চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে।

পুরুষ চরিত্রের চাইতে নারী চরিত্রের বিকাশ এবং বিচিত্রতা প্রকাশ করেছেন লেখক এ উপন্যাসে। এ উপন্যাসে নারীর স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ, মোহ, ভোগ, লালসা এবং এ লোভ, ভোগ লালসার বশবর্তী হয়ে কতটা নিচে নামতে পারে কতটা সর্বনাশ ঘটাতে পারে তা চিত্রায়িত হয়েছে যা কিছু কলুষিত তা চিহ্নিত করেছেন এবং যথার্থ শুভ্রতা ও সুন্দরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। এ উপন্যাসে যতগুলো নারী চরিত্র রয়েছে তার মধ্যে মঞ্জু চরিত্র

ব্যতিক্রমী। উপন্যাসে সবগুলো নারী ভোগমত্ততায় লিপ্ত বিশেষত মঞ্জুর মায়ের দৈহিক জৈবিক চাহিদা সীমাহীন, নির্লজ্জ এবং ভয়হীন। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পরে তার ভাই মঞ্জুর কবির চাচার সাথে তার মায়ের ঘনিষ্ঠতা আর এ ঘনিষ্ঠতার কারণ কী এবং কেন ছোট্ট বালিকা মঞ্জু তা বুঝত না। সে এও বুঝত না যে, দাদু কেন তাঁর মাকে নানার বাড়িতে রেখে এসেছিলেন। সময়ের বিবর্তনে যৌবনে পদার্পণরত মঞ্জুর চোখে আলো পড়েছে, বুঝতে শিখেছে এই সকল ঘৃণ্য নোংরা কার্যকলাপ সম্পর্কে। মঞ্জুর মা সালেহার মনে শুদ্ধতার আলো প্রবেশ করে না। প্রবল জীবনবাদী জৈবিক তাড়না আদিমতম প্রবৃত্তির বশবর্তী ভালোমন্দ জ্ঞানশূন্য একমুখী চরিত্র সালেহা। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় বয়স্ক স্বামীর কাছে সে সুখী নয়। মঞ্জুর মনে হয় মা কীসের সুখের সন্ধান করে "মা বাবাকে চিনতে পারেনি। পারলে মা সুখী হতো।"[৩] সালেহার কীসের অভাব সংসার না অন্য কোনো আকর্ষণ। এ চরিত্রটি এতটাই ভোগলালসায় মত্ত যে, সে ভুলে গেছে নিজের সন্তানদের কথা। মম, পুতুল, মঞ্জুর ওদের দিকে নজর দেওয়ার সময় নেই। মম, পুতুলের জন্মের পর তাদের দেখাশুনার জন্য এ পরিবারে মঞ্জুর আগমন। অবহেলিত মঞ্জু সবসময় ভাবে তার মা কেন তার থাকল না। আসলে সালেহা চরিত্র কারো মা, প্রেয়সী, গৃহিণী হওয়ার জন্য সৃষ্টি হয়নি। তার দৈহিক কামনার দাস সে। শরীরের আকর্ষণই তার পরম আত্মীয়, তাইতো ভাগ্নে বেনুর সামনে আকরামের সাথে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে ও অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে- স্বামীর মামাতো ভাই আকরামের সাথে অবৈধ দৈহিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়, লোকলজ্জার ভয় নেই। এমনকি স্বামীকেও তোয়াক্কা করে না সালেহা।

সালেহা মঞ্জুকে বেনুর সাহচর্যে দেখতে চায়। সে চায় বেনুকে সঙ্গ দিয়ে মঞ্জু নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে নিক, পাশাপাশি বেনু ও তার হাতের পুতুল হয়ে থাকবে এটাও প্রত্যাশা করে। একটু ভালো থাকার প্রবল বাসনা লিবিডো তাড়নায় একাধিক পরপুরুষের সাথে অনৈতিক সম্পর্কে লিপ্ত মঞ্জুর মা। আবার দ্বিতীয় স্বামীকেও হাতে রাখার একটা চেষ্টা তার মধ্যে ফুটে উঠেছে, আবার দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুর জন্যেও সে দায়ী। ভেবেছিলো তার এই বিকৃত লালসার পথের কাঁটা আনিসের বাবার মৃত্যু হলে সে সবদিক থেকে সুখী হবে, বাধাহীন ভয়হীন এক উন্মত্ত যৌনাচার চালিয়ে যেতে পারবে ইচ্ছামতো। কিন্তু বাস্তবে ঘটেছে তার উল্টো। আনিসের বাবার মৃত্যুর পরে আকরাম ও বেনু ভোগদখল করে চৌধুরী বাড়ির সম্পদ ও দোকানের টাকা। শেষ পর্যন্ত বিকৃত রুচির আকরাম সালেহাকে ছেড়ে হাত বাড়ায় কন্যাসমতুল্য মঞ্জুর শরীরের দিকে। আর তখনই সালেহার চোখের পর্দা সরে যায় এবং নিজের কৃতকর্মের অর্থাৎ স্বামীকে ইচ্ছাকৃতভাবে মেরে ফেলার জন্য অনুতপ্ত হয়ে আপন মনে বলে উঠে "হায় এ আমি কী করলাম। আমার বাচ্চা ছেলেমেয়ে দুটোর কী হবে। কোথায় দাঁড়াবে ওরা!"[৪]

ভাগ্যহীনা অসহায় মঞ্জু শৈশবে পিতাকে হারিয়ে মায়ের দ্বিতীয় স্বামীর বাড়িতে আশ্রিতা। নিজ মায়ের দ্বিতীয় বিবাহ পরবর্তী দুই কন্যা মম, পুতুলকে দেখাশোনার জন্য এ বাড়িতে আগমন। কালক্রমে মাও পর হয়েছে। মঞ্জুর ধারণা আনিসের বাবা অর্থাৎ তার মায়ের দ্বিতীয় স্বামী তার দায়িত্ব নিতে চায় না। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে মঞ্জু বুঝতে পারে তার মা আজ পর হয়েছে কিন্তু বাবার ক্ষেত্রে ঘটেছে উল্টোটা। আস্তে আস্তে এই বাবাই হয়েছে মঞ্জুর অভিভাবক এবং মঞ্জুর মনে স্থান করে নিয়েছে বাবার আসনে।

নারীর মনের উন্মুক্ত কামনাবাসনা বাধাহীন বিকৃত প্রেমের উন্মোচন করেছেন লেখক উপন্যাসটিতে। রক্ষণশীলতা গতানুগতিক সংসারধর্ম পালন শিষ্টাচারের চিত্র লেখক এ উপন্যাসে আঁকেন নি, এঁকেছেন সেই সকল নারী চরিত্র যারা হৃদয়ের অন্তরালে শিক্ষায় সভ্যতায় সংস্কারের অচ্ছেদ্য বাঁধন ছিন্ন করে অসংযমী এবং উচ্ছৃঙ্খল, বিবেকহীন পশু কামনার বশবর্তী হয়ে উন্মুক্ত বাসনা, সীমাহীন অনাচার, সতী ধর্মের শৃঙ্খলার বাইরে নির্দিষ্ট করেছে তাদের অবস্থান। যৌবনের উন্মাদনায় তারা নিজেরা অনেকটা আত্মপ্রেমে ভোগে। তাইতো মঞ্জুর ধারণা যে কোনো পুরুষ তাকে দেখলেই প্রেমে পড়ে যায়। রঞ্জু ও নাসিমা মঞ্জুকে খুটিয়ে খুটিয়ে আপদমস্তক দেখে বলে "তুই কেমন করে পারিস তাই ভাবি। কেউ কি তোকে দেখেনি? কেউ কি ভালবাসতে চায়নি?"[৫] রঞ্জু ও নাসিমার কাছে জীবনের সৌন্দর্যের অর্থ আলাদা অসংখ্য পুরুষের সাথে প্রেমে লিপ্ত হয়ে ভোগ লালসায় নিমজ্জিত হওয়ার মধ্য দিয়ে লঘু আনন্দ প্রাপ্তিই জীবন। এটিকেই করেছে তারা বিনোদনের মাধ্যম। মঞ্জু নারী পুরুষের বিকৃত প্রেমে বিশ্বাসী নয়, তাই বলে মঞ্জুর মনে প্রেম নেই তা তো নয়। মঞ্জু পবিত্র মানবী, তাই মানবীয় শুভ্র সুন্দর সত্য প্রেমের প্রত্যাশী। মায়ের দ্বিতীয় স্বামীর প্রথম পক্ষের তিন সন্তান আনিস, রাহুল ও ফরিদা। রাহুলকে সে ভাই ও বন্ধু মনে করে ফরিদাকে ছোটো আপা বলে। কিন্তু আনিসের মা হারা ছন্নছাড়া অগোছালো অযত্নে কাটানো জীবন ও তাঁর ব্যক্তিত্ব মঞ্জুর মন ছুঁয়েছে। যদিও আনিস সম্পর্কে তাঁর ভাই। সমাজ সংসারের কাছে আনিস ও মঞ্জু দুজনেই অপরাধী, এ সম্পর্কের পরিণতি ভয়াবহ লজ্জার, তারপরেও পিছিয়ে পড়ে না মঞ্জু- কারণ সে আনিসকে সত্যি সত্যি ভালোবাসে।

মঞ্জুর বাবা নেই আর মা থেকেও নেই। কারো গর্ভধারিণী মা যে সন্তানের মঙ্গল চিন্তা না করে পার্থিব কামনাবাসনাকে বড়ো করে দেখতে পারে এবং পিতৃহীন এই মঞ্জুকে শুধুই আশ্রিতা ভাবতে পারে তা সালেহা চরিত্রের এক অমানবিক দিক। সালেহা এক অসভ্য আবিল নারী চরিত্র। মানব মনের বিচিত্রতায় এমন চরিত্রের উপস্থিতিও আছে সমাজে। লেখকের পারঙ্গামতায় তা সুস্পষ্টভাবে প্রাণ পেয়েছে এ উপন্যাসে। অন্যদিকে আনিস রাহুল মা-হারা হলেও মায়ের স্থানে সালেহাকে বসাতে পারে না, কারণ মাতৃত্বের যে গুণ, তা সালেহার মধ্যে তারা পায়নি। সালেহা দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসে দুই সন্তান মম ও পুতুলের জন্ম দিয়েছে। তিনবার মাতৃত্বের স্বাদ আস্বাদন করলেও বিকৃত জীবন পিপাসা তার দমে যায়নি। বাঙালি মায়ের চিরন্তন রূপ তথা নারীর চিরন্তন রূপ মাতৃত্ব সালেহা চরিত্রে অনুপস্থিত। তাই সে প্রকৃতপক্ষে আনিস, ফরিদা, রাহুলের মা হয়ে উঠতে তো পারেই না এমনকি গর্ভজাত সন্তান মঞ্জু, মম ও পুতুলের মাও হয়ে উঠতে পারে না। মঞ্জুর কখনো মনে হয় মা তার পর হয়েছে কিন্তু মম ও পুতুল সত্যিকার মাকে পেয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারে লালসার পঙ্কিলতায় নিমগ্ন সালেহা আস্তে আস্তে মম ও পুতুলের প্রতিও উদাসীন হয়ে পড়ছে।

অস্থির চিত্ত অন্ধকার মনের অধিকারী নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা সালেহা স্বামীর অসুস্থতায় তার পাশে থাকলে ক্ষতি হবে জেনেও পাশে থেকে যায়, পরিণামে উত্তেজিত অবস্থায় স্বামীর মৃত্যু ঘটে। সালেহা এভাবে তার দ্বিতীয় স্বামীকে হত্যা করে। তবে লেখকের ভাষায় "কী নিষ্ঠুর মৃত্যু। আর কী কুৎসিত জন্ম।"[৬] লেখক এক কথাতেই আলো ফেলেছেন সালেহা চরিত্রের কলুষতার দিকে। সালেহা আবারও সন্তান সম্ভবা আর এ

অনাগত সন্তানের পিতা আকরাম। তাইতো অনাকাঙ্ক্ষিত এ সন্তানের আগমনকে কুৎসিত জন্ম বলা হয়েছে।

লেখক নারী মনের বিকারগ্রস্ত অস্থির পরিবেশ চিত্রায়ণ করেই থেমে থাকেন নি, এর বিষাক্ত ফলাফলও দেখিয়েছেন যা ধ্বংসাত্মক অনুশোচনাময় এবং যা কখনোই ভালো হতে পারে না। হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগানোর নাম যদি হয় ভালোবাসা তাহলে সে ভালোবাসা এ উপন্যাসে মঞ্জু ব্যতীত আর কোনো চরিত্রে পাওয়া যায় না। লঘু প্রীতি আর শরীরের আকর্ষণকে ভালোবাসার ছাঁচে ঢেলে ঢালাই করতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে চরিত্রগুলো। তাইতো রঞ্জু বিয়ের আগেই প্রেমিক আহসানকে সমর্পণ করেছে দেহমন আর এ কারণে সম্পর্কটা সরল থাকেনি, তাই এ সম্পর্কের মধ্যে অবলীলায় প্রবেশ করেছে সন্দেহ। রঞ্জুদের বাড়িতে আসা শফিক ভাইকে নিয়ে আহসানের মনে সন্দেহ- যা চরম তিক্ততায় পরিণত এবং কৃতকর্মে রঞ্জু অনুতপ্ত। রঞ্জুর মুখ দিয়েই লেখক স্বীকার করিয়ে নিয়েছেন যদি সম্পর্ককে সে এ পর্যায়ে না নিয়ে যেত তাহলে হয়ত চরম তিক্ততা আর সন্দেহের অতলে তলিয়ে যেত না রঞ্জু-

> ভুল করেছি আমিই। যদি আমি নিজেকে ওর হাতে ছেড়ে না দিতাম। যদি এড়িয়ে যেতে পারতাম, তাহলে হয়ত ওর কাছে এত সহজে মূল্য হারাতাম না। আমার যেন এখন আর কোন আকর্ষণ নাই।[৭]

জগৎ-জীবন সম্পর্কে অজ্ঞতা ও সুশিক্ষার অভাব অস্থির চিত্তের কারণে মীনা সিনেমার নায়িকা হবে সেই আশায় সিনেমা হলের দারোয়ানের সাথে পালিয়ে গেলে তাকে ফিরিয়ে আনা হয়। এর পরেও মীনা থেমে থাকেনি, আদিমতম আকর্ষণে প্রবৃত্তি তাড়িত মীনা আবারো আফজালের সাথে পালিয়ে যায়। এ কি প্রেম হতে পারে? নাকি শুধুই শরীরের আকর্ষণ, নিজ শরীরই হয়েছে শত্রু। মীনাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ফুপুর বাড়িতে চিকিৎসার জন্য। তাজিনার চুপ করে থাকায় এবং চিকিৎসার ইঙ্গিতে পাঠকের মনে স্পষ্টভাবে ধরা দেয় যে, মীনা অন্তঃসত্ত্বা। আর সেই চিকিৎসার জন্যই পরিচিত পরিবেশের আড়ালে লোকলজ্জার ভয়ে ফুপুর বাড়িতে পাঠানো হয়েছে মীনাকে।

মঞ্জুর আত্মজিজ্ঞাসা কেন শহরে আসতে গেলাম? প্রকৃতপক্ষে *পিঙ্গল আকাশ* উপন্যাসটিতে সমসাময়িক মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নারীর মনঃসমীক্ষণের বিষয়টি। নারী অসংখ্য রূপে সমাজ সংসারের মানবী, তবে শওকত আলী উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নারীর অসংযত মনকে তুলে ধরেছেন পাঠকের সম্মুখে। এ উপন্যাসে নারীর মনোবিশ্লেষণই মুখ্য উদ্দেশ্য। ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারার পরিণত প্রকাশ। এখানে নারী পুরুষের কাছে নিজেকে রমণীয় করে তুলতে সচেষ্ট এবং এটিই হয়েছে তাদের আনন্দ প্রাপ্তির বা নারীর মনের তৃপ্ততার একমাত্র পথ। এ উপন্যাসে নারীর নিষিদ্ধ প্রেম প্রকাশ্যে প্রকাশিত এবং তার আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। পুরুষ তাকে পছন্দ করে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছে- এই যেন মুখ্য বিষয়। এ উপন্যাসে নারী তার প্রেম ও শরীর বিলিয়ে দিয়েছে পুরুষের কাছে উপহারের বিনিময়ে:

> তাজিনা নিজের কাপড় ও গয়না দেখিয়ে বলে আমার বাবার না হয় টাকা পয়সা আছে আমি এসব পারি। কিন্তু জোহুরা, হান্না ওরা যে এ ধরনের কাপড়, জামা পরে কোথায়

> পায়? বাপ তো কেরানি। কোথায় পায় শুনি?... শুধু শুধু প্রেজেন্ট করবে কেন, কথা নেই বার্তা নেই একশ-দেড়শ টাকার জিনিস প্রেজেন্ট করে বসবে। তার জন্য কিছু দিতে হয় ওদের নিশ্চয়ই। রূপ আর যৌবন ছাড়া আর কি আছে ওদের।[৮]

উপন্যাসে নারীর শারীরিক কামনাবাসনা যেন মুখ্য বিষয়। মঞ্জু নিজেকে ধরে রাখতে চায় কিন্তু শরীর তাকে সংযমী হতে দেয় না তাই এই শরীরটাই তার একমাত্র শত্রু। মঞ্জু জানে শরীরের সৌন্দর্যের জন্যই যেমন বেনু ও তার মতো শরীরলোভী পুরুষের কুদৃষ্টি পড়েছে তেমনি এই শরীরের আকর্ষণই তাকে নিয়ে গেছে আনিসের সান্নিধ্যে। আনিসের স্পর্শ তাকে কলুষিত করে না, কারণ সে আনিসকে শ্রদ্ধা করে ভালোবাসে। শরীর ও মন বলতে যেটুকু মঞ্জুর সবই সে আনিসকে দিতে চায়, কারণ আশ্রিতা বিবেকবোধ সম্পন্ন এ নারী চরিত্রটি অনুধাবন করতে পারে ভালোবাসার স্বরূপ। এ বাড়িতে একমাত্র আনিসই তার কথা ভাবে এবং আনিসের ব্যক্তিত্বে সে মুগ্ধ। তাছাড়া এই পরিবারে মঞ্জুর মা কর্তৃক সৃষ্টি হওয়া অশান্তির ছন্নছাড়া ভালোবাসাহীন পারিবারিক সম্পর্কের কারণে ধ্বংস হচ্ছে চৌধুরী বাড়ি একটু একটু করে, আর এই দায়বদ্ধতা থেকে মঞ্জু মুক্ত নয়। তাই সে ভালোবেসে আঁকড়ে ধরতে চায় পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষকে। ফিরাতে চায় ভালোবাসার আবর্তে, কিন্তু পুরোপুরি পারে না, কারণ সে এ বাড়ির কেউ না- তাই সাধ ও সাধ্যের সমন্বয় হয় না। মঞ্জুর দীর্ঘশ্বাস-

> আমি যদি এই বাড়ির কেউ হতাম, যদি ওরা আমাকে ছোট আপার মতো করে আপন করে দেখতো। সবাই আমার অধিকার স্বীকার করে নিত, ওদের সবার হাত ধরে আমি ফেরাতাম।... কিন্তু পারি না। আমাকে কেউ বিশ্বাস করবে না, আমার অমন মিনতি দেখে পাগল ভাববে। আমাকে কেউ বুঝবে না।[৯]

ছিটকে পড়ে পরিবারের মানুষগুলো, বিপন্ন হয় সম্পর্ক আর তাতে নোনা ধরে চৌধুরী বাড়ির ভিতে। মঞ্জু সবকিছু বুঝতে পারে কিন্তু সে অসহায়, তার কিছুই করার ক্ষমতা নেই। অথচ যারা পারে চৌধুরী বাড়ির এ ভাঙনকে রোধ করতে তারা কেন এসব বোঝে না।

পিতার সমবয়সি বরকত এলাহী ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে মঞ্জুরকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়, তখন সালেহা অর্থাৎ মঞ্জুর মা রাজি হয়ে যায়। শুধু নিজে ভালো থাকার মানসে এ সিদ্ধান্তে সালেহাকে মঞ্জুর গর্ভধারিণী মা বলে মনে হয় না। তবে বাবা অর্থাৎ আনিসের বাবা জন্মদাতা না হয়েও মঞ্জুর প্রকৃত বাবার ভূমিকায় স্নেহের হাত বুলিয়েছে কন্যা সমতুল্য মঞ্জুর মাথায়। বাবার মত বলেছে দোকান বন্ধ হলেও তিনি বরকত এলাহীর মত একজন লোভী একজন বয়স্ক মানুষের হাতে মঞ্জুকে তুলে দিতে পারবেন না। এই বাবাই হয়েছেন প্রকৃত বাবা। এ প্রসঙ্গে পালিত বাবার উক্তি-

> সেই জন্য ভাবিস না, হঠাৎ বাবা জোরে নিশ্বাস নিয়ে বললেন, আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ তোর সব দায়িত্ব আমার। তোর যা ভালো লাগবে না, তা আমি কক্ষনো হতে দেব না।[১০]

মঞ্জুর বান্ধবী নাসিমা পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস করে না, তাই প্রেমের অভিনয় করে বশে এনে পাড়ার ছেলেদের দিয়ে মার খাওয়ায় আবার নারীর স্বভাবসুলভ মমতায় নিমগ্ন হয়ে সেই ছেলেকেই পাবার জন্য একের পর এক চিঠি লেখে। এ এক আশ্চর্য বিচিত্র মন বহন করে

চলেছে নাসিমা। নাসিমা প্রকৃতপক্ষে কী চায় তা সে নিজেই জানে না। তবে এক সময় নাসিমাও জামিলের প্রেমে পড়েছে, জামিলকে ছাড়া তার জীবন শূন্য মনে হয়।

মঞ্জুর মা জীবনভোগী নারী। ব্যক্তি জীবনে হয়ত সে চেয়েছিল 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'-এর গৃহদাহ উপন্যাসের সুরেশের মতো প্রেমে উন্মত্ত তরুণ সচ্ছল উচ্চবিত্ত বিলাসী স্বামী। যদি তা সে পেত তাহলে হয়তো এ ভয়ংকর নোংরা জীবনে সে অভ্যস্ত হতো না। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে তার চারিত্রিক স্খলনের পরিচয় পাওয়া যায় না। ভোগবাদী দর্শনে বিশ্বাসী এ নারী স্বামীর মৃত্যুর পরে লিবিডো তাড়িত। শুধুমাত্র দৈহিক কামনার বশবর্তী হয়ে কবির চাচার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। দ্বিতীয় স্বামী বয়সে প্রৌঢ়, তিন সন্তানের জনক মধ্যবিত্ত জীবনে সংসারের খরচ জোগাড় করতে গিয়ে স্ত্রীর সকল চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় না। তাই সে এখানে জুটিয়েছে স্বামীর মামাতো ভাই আকরামকে।

ছুটির দিনে সকিনা খালা স্বামী রহিম সাহেবের সাথে যখন বেড়াতে যায় তখন তাদের আর্থিক সচ্ছলতা ও প্রেমময় জীবনের খিলখিল হাসিতে মঞ্জুর মায়ের মনে হিংসা ও না পাওয়ার ক্ষিপ্ততা হৃদয়ে দাবানল সৃষ্টি করে এবং ফলাফল স্বরূপ স্বামীর সাথে সারাদিন খারাপ ব্যবহার করে। এ আচরণে মঞ্জুর মায়ের চরিত্রটি অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অপ্রত্যাশিত জীবন ও মধ্যবিত্ত সংসার, সীমাহীন লোভ ভোগ লালসা কামনাবাসনার বশবর্তী সালেহা নির্দ্বিধায় স্বামীকে উপেক্ষা করে বেছে নিয়েছে নিজের পছন্দমতো উচ্ছৃঙ্খল জীবন। স্বামীর উপস্থিতিতেই সে আকরামের সাথে হাসিঠাট্টায় মেতে উঠেছে আবার বাড়ির সবার চোখে ধুলো দিয়ে আকরামকে সাথে নিয়ে রাত কাটিয়েছে। বিকৃত লালসার বশীভূত এ নারী দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুর পরে হয়ে ওঠে আরো রূপ সচেতন-সৌন্দর্য পিপাসু। নতুন নতুন পোশাক, প্রসাধনী, ক্রিম, পাউডার আরো কত কী ব্যবহার করে। মঞ্জুর বর্ণনায়-

> মায়ের চেহারার মধ্যে যেন কোথায় একটি তৃপ্তির আভাস দেখা যায়। শরীরের উজ্জ্বলতা বেড়েছে। চোখ দুটোতে কী যেন ভরে এসেছে। বেশ লাগে মাকে দেখতে-খুব সুন্দর মনে হয়।[১১]

মায়ের এহেন নির্লজ্জ বেহায়াপনা আচরণে ঘৃণায় প্রতিবাদে ১৭ বছরের মঞ্জু শরীরে পেঁচিয়ে নেয় সাদা শাড়ি আর ত্যাগ করে সকল প্রসাধনী। এই অসহিষ্ণু নারী সালেহার গর্ভজাত হওয়ার পরেও মঞ্জুর এ সীমিত পরিমিত নীতিবাদী জীবনবোধ শুভ্রতা, শুদ্ধতা, সদাচার, সম্পন্ন বিচক্ষণ বিবেকবান সত্তার প্রকাশ সত্যিই প্রশংসনীয়।

লেখকের এ উপন্যাসে পাশাপাশি দুটো স্রোত প্রবাহিত হয়েছে। এক নারীর মনঃসমীক্ষণ অন্যটা পুরুষের লালসা। পুরুষের মনের বৈচিত্র্যকে লেখক সচেতনভাবে ফুটিয়ে তোলেননি। তবে পুরুষশাসিত এ সমাজে একজন নারী কীভাবে তাঁর লালসার শিকারে পরিণত হয়ে জীবনের স্বপ্নগুলোকে বিসর্জন দিয়ে প্রাণশক্তি হারিয়ে প্রতিনিয়ত নিজের বিবেকের সাথে যুদ্ধ করে, দগ্ধ হয়ে, অশুচি অপবিত্র জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। সে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন ঔপন্যাসিক অত্যন্ত সার্থকভাবে।

উপন্যাসটিতে বিবেকবোধের শুদ্ধাচারের প্রতীক মঞ্জু। একাধিকবার এ চরিত্রটির মুখ দিয়ে লেখক বলিয়েছেন "আমি শুভ্র হতে চাই সুন্দর হতে চাই।" এ শুভ্রতা ও সুন্দরের সন্ধান

মঞ্জু পেয়েছিলো। কিন্তু তাজিনার বন্ধু তেল কোম্পানির চাকুরে কাসেম খানের কু দৃষ্টি পড়ে মঞ্জুর শরীরের দিকে এবং বেনু ও তাজিনাদের সাথে পিকনিকে যাওয়ার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়ে মঞ্জু হয়েছে সর্বহারা, সতীত্ব হারা, নিঃস্ব, রিক্ত। সে কারণেই শুভ্র আর সুন্দর থাকা হলো না মঞ্জুর। আনিস ট্রেনিং শেষে বাড়ি এলে মঞ্জু কেমন করে তার এ অপবিত্র ক্লেদাক্ত শরীরটা নিয়ে আনিসের সামনে দাঁড়াবে? তাই সকল আশ্রয় ত্যাগ করে মঞ্জু ঝড়বৃষ্টির রাতে বের হয়েছে অজানার উদ্দেশে।

বাবার দ্বিতীয় বিয়ে এবং মম ও পুতুলের জন্মের সাথে সাথে একটু একটু করে দূরে সরে গেছে তাদের বাবা। ফরিদার বিয়ের বয়স হয়েছে। সে বিয়ে করে সৎমায়ের সংসার ত্যাগ করে সুখী হতে চায় কিন্তু গায়ের রংটা শত্রু হয়েছে ফরিদার। তাই ভালো সম্বন্ধ না পাওয়ায় বিয়ে দিতে পারে না ফরিদার বাবা। বাবা নতুন বিয়ে করে তার মাকে ভুলে গেছে। মায়ের ছবিকে অবজ্ঞা করেছে। অভিমানে কষ্টে ফরিদা বাড়ি ছাড়ে এবং অবশেষে পুরুষের আদিম তম লালসার শিকার হয়। প্রসঙ্গত সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> এখানে লেখকের অভিব্যক্তিতে স্পষ্ট হয় শিক্ষিত এবং তথাকথিত উচ্চ ভদ্র সমাজে অন্তর তন্ত্রীতে লুকায়িত বিষবাষ্প অর্থাৎ যেখানে নারীকে স্বনির্ভর হওয়ার বিনিময়ে ছাড় দিতে হয় নিজের সম্ভ্রম। যেখানে নারীর শিক্ষা-জ্ঞান-যোগ্যতাকে পদদলিত করা হয়। সমাজের সর্বস্তরেই মুখোশধারী পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কাছে নারীর নিজস্ব চাহিদা ও ভোগ্যসামগ্রীরূপে গণ্য হয়। তাই ফরিদার মতো নারী পদদলিত হয় হাই সোসাইটতে।[১২]

বিদেশে ভালো চাকুরির লোভে ও ভালোভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে যৌবন আর স্বাস্থ্য দুটোকেই সমর্পণ করতে হয়েছে ফরিদাকে। আজ ফরিদা সব পেয়েছে জীবন থেকে সব হারিয়ে। কলুষিত এ জীবনকে তাই সে মৃত বলে দাবি করেছে, কারণ এ জীবন সে কখনো প্রত্যাশা করেনি। মঞ্জুর কাছে লেখা চিঠিতে প্রকাশ পেয়েছে তার বর্তমান অবস্থার কথা:

> বিদেশে আসার জন্য স্বাস্থ্য আর যৌবন থাকলে মেয়েদের যা যা করতে হয়- আমাকেও তা করতে হয়েছে। কতখানি নরকে নামতে হবে জানতাম। তবু আমি করেছি। এত নিজেকে হত্যা করা। সবচেয়ে কি আশ্চর্য জানিস, যে আমাকে নিয়ে পুতুল পুতুল খেলছে সেই আমাকে এখন ঘরের স্বপ্ন দেখায়। মঞ্জুরে, সেইখানে যে আমার সব চাইতে বড়ো অপমান। আমার মত ভুল তুই করিস না। জীবনকে সুন্দর করে তুলিস, যে কোন মূল্যেই হোক।[১৩]

অন্যদিকে *পিঙ্গল আকাশ* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং নায়িকা চরিত্র মঞ্জু পরিমিতিবোধ সম্পন্ন নারী চরিত্র। সৃষ্টি ধ্বংস, গড়ন, ভাঙন সবই সে বোঝে, সবকিছুকে সে অনুধাবন করতে পারে। আনিস প্রথমবার তাকে আলিঙ্গন করার অপরাধবোধে বাড়ি ছাড়ে। আনিস মুখে কিছু না বললেও মঞ্জু তা ঠিকই বুঝতে পারে। পরবর্তীতে লেখক আনিসের মুখ দিয়ে স্বীকারোক্তি করিয়েছেন যে মঞ্জুর সুন্দর শরীরের লোভেই আনিস মঞ্জুর দিকে হাত বাড়িয়েছিল। এ পাপবোধেই সে মঞ্জুর নিকট থেকে দূরে সরে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সত্যি সত্যি আনিস মঞ্জুকে ভালোবাসতে শুরু করে। এবং চিন্তা চেতনায় মঞ্জুকে সব সময় অনুভব করে। লোকলজ্জার ভয় আছে তারপরেও মঞ্জুর ভালোমন্দ সকল দায়ভার আনিস আর কখনো এড়াতে পারবে না, কারণ আনিস মঞ্জুকে সত্যি ভালোবাসে। আনিসের

এ স্বীকারোক্তি মঞ্জুর মেনে নিতে কিছুটা কষ্ট হলেও এ অপরাধের দায়ভর একা আনিসের কাঁধে সে চাপিয়ে দিতে নারাজ, কারণ দোষ যদি থাকে তো সে দোষের ভাগীদার মঞ্জু নিজেও। সব কিছুর মূলে আছে মঞ্জুর সুন্দর শরীর আর তার আনিসকে কাছে পাওয়ার লোভ। সৌন্দর্য আর লোভের বশবর্তী হয়েই এ উপন্যাসে ঘটেছে একের পর এক নিষিদ্ধ অথচ চমকপ্রদ ঘটনা। মঞ্জু বেনুর কুদৃষ্টির জন্য দায়ী করেছে নিজের শরীরকে। বেনুর কুদৃষ্টি, কুপ্রস্তাবকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। পরবর্তীতে অনেকটা বিদ্রোহী নারীর মত বেনুর সামনে শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ সে বুঝেছিল পালিয়ে বাঁচা যায় না, লড়াই করেই বাঁচতে হয়। মঞ্জুর কাছে থেকে সাড়া না পাওয়ায় ক্ষিপ্ত বেনু তাজিনার সাথে সম্পর্ক গড়েছে। তাজিনার সাথে ষড়যন্ত্র করে কাশেম খানের ফাঁদে মঞ্জুকে ছেড়ে দেয় এবং মঞ্জু কর্দমাক্ত সমুদ্রের মাঝে আস্তে আস্তে তলিয়ে যায়। সারা শরীরে ঘৃণার প্রলেপ নিয়ে তার পরম শ্রদ্ধেয় প্রাণস্পদ আনিসের সামনে কোন মুখ নিয়ে সে দাঁড়াবে। সেই চিন্তায় বিভোর মঞ্জু বাড়ি ছাড়ে অজানার উদ্দেশ্যে। মঞ্জু আগেই বুঝতে পেরেছিল এ বাড়ি তাকে ছাড়তেই হবে আজ অথবা কাল।

বাল্যকালে পিতা মাতাহীন অবস্থায় মঞ্জু বড়ো হয়েছে। চার বছর হলো মায়ের দ্বিতীয় স্বামীর বাড়িতে আশ্রিতা। নিজের প্রয়োজনটুকু বলার মানুষও নাই। মা পর হয়েছে অনেক আগেই। এ বাড়িটাকে হোটেল মনে হয় মঞ্জুর কাছে। সবাই কেমন যেন ছাড়া ছাড়া তাই মনের সকল কষ্ট ও কথাগুলোকে লিপিবদ্ধ করেছে মঞ্জু ডায়রির পাতায়। আর আকস্মিকভাবে মঞ্জুর এ ডায়রি থেকে গেছে ঝড় বৃষ্টির রাতে ক্ষণিক আশ্রয়দাতা আনিসের বন্ধু লেখক চন্দনের ঘরে। অত্যন্ত কৌশলে লেখক উপন্যাসের সূচনা করেছেন। একটি মাত্র ডায়রির কয়েকটি পাতায় লেখা নারী মনের আকুলতার কথায় পূর্ণাঙ্গ একটি উপন্যাসকে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন যা সত্যিই অভিনব।

পুরুষের লালসার শিকার মঞ্জু বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার মুহূর্তে মাঝরাতে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির মধ্যে কেন একজন পুরুষের ঘরের দরজাতেই ধাক্কা দিয়ে আশ্রয় নিল? কোনো কিছু হারাবার বা আবারও লালসার শিকার হবার ভয় কি তার মধ্যে ছিল না? না কি এত ঘটনার পরেও সে পুরুষ জাতিকে পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারে না? হতে পারে মঞ্জুর বিশ্বাস পৃথিবীতে ভালো-খারাপ, বিবেকবোধ সম্পন্ন এবং বিবেকহীন উভয় প্রকারের মানুষই রয়েছে। তাছাড়া লেখক চন্দন তো আবার আনিসের বন্ধু, যে আনিস মঞ্জুকে শুভ্র ও সুন্দরের সন্ধান দিয়ে বাঁচতে শিখিয়েছে। সেই আনিসের বন্ধুতো খারাপ বিবেকহীন হতেই পারে না। শুধুমাত্র এ বিশ্বাস থেকেই মঞ্জু গভীর রাতে লেখক চন্দনের ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলে নাকি আরও অন্য কারণ আছে।

একথা স্পষ্ট যে, মঞ্জু তার লেখা ডায়েরি চন্দনের কাছে দিয়ে যাবে বলেই হয়ত গভীর রাতে তার ঘরে আশ্রয়ের জন্য এসেছিলো। আবার সে ডায়রিটা ইচ্ছাকৃতভাবে রেখে কিছু না জানিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে হারিয়ে গেছে। হয়ত আনিসকে যে কথা সামনাসামনি বলতে পারবে না সে কথাগুলো জানানোর জন্য অর্থাৎ তার নিরুদ্দেশ যাত্রার কারণ যেন আনিস

জানতে পারে এ গভীরতর চিন্তা থেকেই মঞ্জুর এহেন আচরণ। তাই বিশ্লেষণে বলা যায় ডায়রিটা সে ভুল করে রেখে যায় নি-

> এ ডায়রি কেউ পড়বে না। প্রাণ থাকতে কোন মেয়ে তার জীবনের এই সব ঘটনা আর কাউকে জানতে দেয় না। আমিও পারি না। কিন্তু আমার রাগ হয়। নিজের এই সংকোচ আর ঘেন্নার উপর আমি রাগে জ্বলে উঠি। মনে হয়, জানুক আর সবাই। জানুক, আমাকে কেমন করে হত্যা করেছে মানুষের লোভ আর ঘৃণা।[১৪]

তবে মঞ্জু নিরুদ্দেশ যাত্রায় যাবার পূর্বে তার সত্তার মাঝে সমকালীন পঙ্কিলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটিয়েছে। এই প্রথম সব হারিয়ে মঞ্জুর দ্বিধা সংকোচ ভরা মনে বিদ্রোহের আভাস পাওয়া যায়। বেঁচে থাকার আকঙ্ক্ষা স্বাভাবিক, তাইতো মঞ্জুর মনে আত্মহত্যার চিন্তায় সংকোচের প্রকাশ:

> হয়তো আমিও এক সময় এমনি ঘৃণার মধ্যে বেঁচে থাকার অভ্যস্ততায় সহজ হয়ে উঠব, হয়ত তখন বেঁচে থাকতে ইচ্ছেও করবে। বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করবে- যেমন বেঁচে থাকতে পারছে তাজিনা, দুলু, মিনা, রঞ্জু ওদের মতো। কিন্ত সমস্ত জীবন ধরে, আমি কি অমন জীবন চেয়েছি?[১৫]

পর মুহূর্তেই মর্মবেদনায় জর্জরিত মঞ্জুর আত্মকথন। আর এ অপমানের প্রবল বিদ্রোহী মঞ্জু আত্মহননের প্রত্যয় নিয়ে বাড়ি ছেড়েছে।

> আমি যে কোন মতে ভুলতে পারি না আমি শুভ্রছিলাম, পবিত্র ছিলাম। জীবনকে ভালোবেসে আমি সুন্দর শুভ্র আর পবিত্র করতে চেয়েছিলাম। আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাঁচতে চেয়েছিলাম সেই পবিত্র শুভ্রতার মধ্যে। জন্ম জন্ম ধরে এমনিভাবে বাঁচবার বড়ো সাধ ছিলো আমার। জীবনের কাছে আমি কিছুই চাইনি, শুধু বাঁচতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওরা আমায় বাঁচতে দিল না।[১৬]

উপন্যাসের তথা ডায়রিতে লেখা সর্বশেষ লাইনটি সব নয়। একজন মানুষ জীবন যন্ত্রণা নিয়ে জীবনে অমীমাংসিত, সমাধান যোগ্য নয় এমন সমস্যাকে সাথি করে আত্মহত্যার প্রবণতা নিয়ে বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা মানেই আত্মহনন নয়।

এক রাত্রির ক্ষণিক স্মৃতি মঞ্জু কর্তৃক বড়ো বোনের মতো আচরণ সব মিলিয়ে চন্দন এটুকু বুঝেছে এ মেয়ে খারাপ হতেই পারে না। যখন ডায়রিটা পড়েছে তখন তার ধারণা আরো স্পষ্ট হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নারীর গভীর মনঃসমীক্ষণ উন্মোচন ও পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষের ঘৃণ্য লালসার শিকার হয়ে সত্য সুন্দরের অপমান লাঞ্ছনার চিত্র এঁকেছেন লেখক শওকত আলী তাঁর *পিঙ্গল আকাশ* উপন্যাসে। তিরিশ বছর গবেষণা করে বিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড নিজে বলেছেন- "নারী কি চায়?" এই একটি প্রশ্নের সমাধান তিনি পাননি অর্থাৎ নারীর মনের ভাষা ত্রিশ বছরের সাধনাতেও পুরোপুরি বোঝা সম্ভব হয় নি, তার মতে প্রতিটি নারী ধারাবাহিক শিশ্নাসূয়া (পেনিস এসভি)। ফ্রয়েড নারীকে স্বায়ত্তশাসিত মানুষরূপে না দেখে দেখেছেন পুরুষের ঋণাত্মক প্রাণীরূপে। তিনি আরও বলেছেন "দেহই নিয়তি" "অ্যানাটমি ইজ ডেসটিনি"[১৭] যে কথা এ উপন্যাসে মঞ্জু অনেকবার অনুধাবন করেছে শরীরই তার প্রধান শত্রু। মঞ্জুর ভাষায় "আমার শরীরটাই হয়েছে কাল"[১৮] ফ্রয়েডের নারী নিজের বিকলাঙ্গ শরীরের শিকার। তিনি যে দেহের নিয়তির কথা এবং নারী-পুরুষের

আদিমতম প্রবৃত্তি যার নাম দিয়েছেন লিবিডোতত্ত্ব সে তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন ঘটিয়েছেন লেখক *পিঙ্গল আকাশ* উপন্যাসে। এ উপন্যাস নারীর মনঃসমীক্ষণের উৎকৃষ্ট উদাহরণ এবং পাশ্চত্য সাহিত্য দর্শনে রচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে অন্যতম।

তথ্যসূচি:

---

১ শাফিক আফতাব, শওকত আলীর উপন্যাস কলাকৌশল ও বৈশিষ্ট্য (ঢাকা: ভাষাচিত্র, একুশে বইমেলা-২০১৪) পৃ. ১৯, ২৬
২ চন্দন আনোয়ার সম্পাদিত গল্পকথা, শওকত আলী সংখ্যা (রাজশাহী: ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬), পৃ. ৬২
৩ শওকতা আলী, রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড (ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, বইমেলা-২০১৪) পৃ. ৫৫
৪ তদেব, পৃ. ১২৪
৫ তদেব, পৃ. ৯৭
৬ তদেব, পৃ. ১০৯
৭ তদেব, পৃ. ৯৭
৮ তদেব, পৃ. ৯৩
৯ তদেব, পৃ. ৩৮
১০ তদেব, পৃ. ৫৪
১১ তদেব, পৃ. ৯৫
১২ চন্দন আনোয়ার সম্পাদিত গল্পকথা, শওকত আলী সংখ্যা, প্রাগুক্ত পৃ. ১১৩
১৩ শওকতা আলী, রচনা সমগ্র, প্রাগুক্ত পৃ. ১১৭
১৪ তদেব, পৃ. ১৪৫
১৫ তদেব, পৃ. ১৪৫
১৬ তদেব, পৃ. ১৪৬
১৭ হুমায়ন আজাদ, নারী (ঢাকা: ওসমান গণী আগামী প্রকাশনী, ২০০০) পৃ. ১৫৩-১৫৪
১৮ শওকতা আলী, রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৪